## দখলদারিত্বের তিন বছর

# ‘মুক্ত’ ইরাকের হাল

জামান আরশাদ

মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোর তুলনায় ইরাকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। ভিন্ন ধরনের বলতে, চিন্তা-চেতনায় ইরাকিরা ছিল বেশ উদার। তারা ধর্ম পালন করতো। তবে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দিত না। সৌদি আরব, কুয়েত যখন নারী শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহী নয়, তখন ইরাক তার নারীদের শিক্ষায় বিশেষ জোর দিত। ইরাকের মধ্যবিত্তদের জীবনে মোটামুটি সুখ ছিল। চলচ্চিত্র, মঞ্চ নাটক, কবিতার বেশ ভালো পৃষ্ঠপোষক ছিল ইরাকিরা। তবে এটা ঠিক যে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার তারা পেত না। তার পরও তারা অসুখী ছিল না। কিন্তু আজ তারা অসুখী। ২০০৩ সালের ১৯ মার্চ ইরাক অভিযানের পর আজ সেখানে নাগরিক জীবনে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা বলতে কিছু নেই। প্রতিদিনই ঘটছে জাতিগত দাঙ্গা, আত্মঘাতী হামলা। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের সরবরাহ।

অথচ যুক্তরাষ্ট্র বলেছিল, হে ইরাকবাসী, তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমাদের জন্য স্বাধীনতা নিয়ে আমরা আসছি। তোমরা একটি স্বাধীন, মুক্ত গণতান্ত্রিক দেশে বাস করবে। বুশের এ কথায় বিশ্বাস করেছিল অনেকেই। কুর্দি ও শিয়ারা বেশি করেছিল। শিল্প-সংস্কৃতির মানুষগুলো ভেবেছিল, সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করে মার্কিনিরা একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। নতুন সরকার ক্ষমতা নেবে। তারা ভালোভাবে বাঁচবে।

কিন্তু তার কিছুই হয়নি। ইরাকিরা আজ একটি হতভাগ্য জাতি। সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মঘাতী হামলা আর অপহরণ আতঙ্ক। গত তিন বছরে প্রায় ২ হাজার ইরাকি নারী অপহৃত হয়েছে। যাদের অনেককেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে দেশের বাইরে। অসংখ্য শিশু অপহৃত হয়েছে। অনেক শিল্পকে হত্যা করা হয়েছে।

ইরাকে বিশিষ্ট কবি আবদুল্লাহ আল বাগদী সাদ্দামবিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি চরম হতাশ। তার ধারণা, শত গুণে ভালো ছিলেন তারা সাদ্দাম আমলে। ২০০৩ সালের ৯ এপ্রিল বাগদাদের আল ফেরদৌস স্কয়ার থেকে যেদিন সাদ্দামের কংক্রিটের মূর্তি ভেঙে ফেলা হলো। সেদিন তিনিও মূর্তি ভাঙায় অংশ নিয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন, শিল্প বুদ্ধিজীবীরা এবার হাত খুলে লিখতে পারবেন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবেন। কিন্তু টেলিফোন লাইন বিকল করে, পানি-বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নাজুক করে বর্তমান প্রশাসন তাকে যে মানসিক কষ্ট দিয়েছে, তাতে তার লেখনী বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়েছেন।

*মার্কিন দখলদারিত্বের তিন বছরে ইরাক পরিণত হয়েছে বধ্যভূমিতে*

পরিসংখ্যানে মেলে, গত তিন বছরে ইরাকে সাধারণ মানুষ মারা গেছে প্রায় এক লাখ। এর একটি অংশ মারা গেছে মার্কিন-ব্রিটিশ সেনাদের গুলিতে আর বাকি অংশটির মৃত্যু হয়েছে জাতিগত দাঙ্গায় সিয়ারা সুন্নিদের মেরেছে সুন্নিরা শিয়া ও কুর্দিদের মেরেছে। আর নিহত মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা দুই হাজারের ওপরে। প্রতিদিনই বাড়ছে নিহতের সংখ্যা।

গত তিন বছরে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুন্নিদের। মার্কিনবিরোধী অভিযানে মূলত নেতৃত্ব দিচ্ছে তারাই। আবার বিভিন্ন স্থানে আত্মঘাতী হামলা, শিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে জড়িত রয়েছে তারাই। কারণ তারা ইরাক শাসন করে আসছে সেই ষোড়ষ শতকে ওসমানী সাম্রাজ্যের সময় থেকেই। সাদ্দামের পতনের আগ পর্যন্ত তারাই ছিল দেশের কর্তা। অথচ তারা কিন্তু মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩৭ শতাংশ আর শিয়ারা ৬০ শতাংশ। অথচ সাদ্দাম আমলে শিয়ারা নির্যাতিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আল তিকরিতি নিজেও একজন সুন্নি। সাদ্দাম-পরবর্তী সময়ে মার্কিনিদের হাত ধরে তারা ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছায় এবং সুন্নিদের যেকোনোভাবে ক্ষমতার বাইরে রাখার চেষ্টা করে।

যদিও গত তিন বছরে শিয়া ও সুন্নিদের মনোভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তারা বিবাদ ভুলে কাছাকাছি আসতে চাচ্ছে। কিন্তু মাঝেমধ্যে শিয়া মসজিদে বোমা হামলা তাদের কাছে সীমার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এরই মধ্যে ইরাকি পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসেছে। তবে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন আলোচনা সফল হয়নি। ৪০ মিনিট পর অধিবেশন মুলতবি করে দেওয়া হয়।

এ পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন বাহিনী ইরাকে বিদ্রোহী দমনে শুরু করেছে ব্যাপকভিত্তিক অভিযান। এরই মধ্যে শতাধিক কথিত বিদ্রোহীকে তারা আটক করেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরাকে একটি জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব হলে মার্কিন বাহিনীর সেখানে অবস্থানের আর প্রয়োজনই নেই। মার্কিন সেনারা বিদায় নিলেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সামাজিক স্থিতিশীলতা। তাদের ইরাক ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে সমাধান।